ইসলামী সংস্কৃতির অর্থ

আবুল হাশিম

শিল্প ও সংস্কৃতি

অনেকে মনে করেন যে সাহিত্য, সংগীত, নৃত্য, কারুকার্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য প্রভৃতি শিল্পকলাই সংস্কৃতি। ইহা সত্য নহে। অর্থাৎ শিল্পকলাই সংস্কৃতি নহে- উহারা সংস্কৃতির বাহন। একই শিল্পের মাধ্যমে বিশ্বের যে কোন সংস্কৃতির অভিব্যক্তি হইতে পারে। সাহিত্যে একই রীতির অনুসরণে শব্দ-ব্যঞ্জনা, উপমা-অলংকার, অনুপ্রাসের প্রয়োগ করিয়া একই রূপ রচনা-শৈলীর মাধ্যমে ভিন্নতর জীবনবোধ ও জীবন ধারার অভিব্যক্তি ও প্রতিফলন হইতে পারে। সংগীতে এরই সুর-তাল-লয়ের ব্যবহারে এবং নৃত্যে একই মুদ্রা ও তালের প্রয়োগে বিভিন্ন জীবনবোধ ও জীবন-ধারা হইতে উৎসারিত ও নিঃসৃত রস পরিবেশিত হইতে পারে। এইভাবে কারুকার্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য প্রভৃতি যাবতীয় শিল্পের ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য।

সংস্কৃতির সংজ্ঞাঃ

এখন প্রশ্ন হইতেছে, শিল্প যদি সংস্কৃতির বাহন হয়, তবে সংস্কৃতি কাহাকে বলে? মানুষের দৈহিক ও মানসিক বৃত্তিসমূহের উৎকর্ষ সাধন এবং তাহার ব্যবহারিক জীবন ও প্রত্যক্ষ জড়-পরিবেশে সেগুলির ফলিত রূপই হইতেছে সংস্কৃতি। জীবন ও জগতের প্রতি মানুষের বিশেষ বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি এই বৃত্তিসমূহের পরিচর্যার ধারা ও পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাহার ফলে মানুষের ব্যক্তি ও সমষ্টি-জীবনের সংস্কৃতিতেও বিশেষ বিশেষ রূপ পরিদৃষ্ট হয়। তাই সংস্কৃতির উপর জীবনাদর্শের প্রভাব অত্যন্ত গভীর, ব্যাপক ও মৌল; আর এ কারণেই জীবনাদর্শ ভিন্ন হইলে সংস্কৃতিও ভিন্ন হইতে বাধ্য।

ইসলামী সংস্কৃতিঃ

ইসলাম একটি জীবন-দর্শন। এই জীবন-দর্শন মানুষের বৃত্তিসমূহ পরিচর্যার ধারা ও পদ্ধতিকে যে-ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাহার ফলে মানুষের ব্যবহারিক জীবন ও পরিবেশে যে সংস্কৃতি ফলিত হয়, তাহাই ইসলামী সংস্কৃতি। সুতরাং ইসলামী সংস্কৃতিতে ইসলামের মূল্যবোধগুলি সক্রিয় থাকিবে; অর্থাৎ ইসলামী সমাজে সাহিত্য, সংগীত, নৃত্য, চিত্র, স্থাপত্য, ভাস্কর্য প্রভৃতি শিল্পকলা ইসলামী বাহন হইবে।

ইসলামী সংস্কৃতির রূপঃ

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করিয়াছেন, "আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাংগ করিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করিলাম ও ইসলামকেই তোমাদের জন্য দ্বীন নির্দিষ্ট করিলাম।" কুরআনুল কারীম দ্বীনের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, ""দ্বীন হইতেছে আল্লাহ্ তায়ালার ফিতরাত, যাহার ছাঁচে মানুষের ফিতরাত অর্থাৎ প্রকৃতি গঠন করা হইয়াছে।" এ-কথার তাৎপর্য এই যে, যে-সকল অমোঘ প্রাকৃতিক নিয়ম মানুষের ব্যষ্টি ও সমষ্টি-জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে তাদের সমষ্টির নাম দ্বীন, এবং পৃথক পৃথকভাবে এই প্রকার বিশেষ প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বীনের এক-একটি বিশেষ অংগ। সুতরাং ইসলামের দৃষ্টিতে দ্বীনের বিরোধিতার অর্থ প্রকৃতির বিরোধিতা। মানুষ নিজ প্রকৃতির বিরোধিতা করিয়া কোন দিনই সুখী ও সমৃদ্ধ হইতে পারিবে না; বরং একমাত্র নিজ প্রকৃতির সহিত সুসংগতি রক্ষা করিয়াই সে নিজের ইহকাল ও পরকালকে উজ্জ্বল ও আনন্দময় করিতে পারে। ইসলাম

মানব-প্রকৃতির মূল তত্ত্বগুলির ভিত্তিতে জীবন-ব্যবস্থার বিধান দেয়। সুতরাং ইসলামের প্রভাব ও প্রতিফলন মানব-জীবনের সর্বক্ষেত্রেই প্রতিভাত হয়।

আধ্যাত্মিক জীবনেঃ

কুরআনুল কারীম বলেন, আল্লাহ তায়ালা মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন শ্রেষ্ঠ ছাঁচে এবং মানুষের সম্ভাবনা অপরিসীম। এই অপরিসীম সম্ভাবনার অধিকারী মানুষ যখন তাহার জড়-সম্পদ ভোগ-লিপ্সার দাসে পরিণত হয়, তখন সে নিজেকে নিকৃষ্টতম জীবে পরিণত করে। সৃষ্টিতে সবার উপরে মানুষ শ্রেষ্ঠ, তাহার উপরে নাই। মানুষের এই শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ন রাখার সাধনাই আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি। মহানগরী কলিকাতার জড়-আড়ম্বরের প্রতি কটাক্ষ করিয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেনঃ

''ই'টের পরে ই'ট মাঝে মানুষ কীট।

মানুষ যখন নিজ মর্যাদা প্রদর্শনের জন্য তাহার জড়-পরিবেশের উপর নির্ভরশীল হয়, তখন সে তাহার বাহ্য আড়ম্বরের পটভূমিতে কীট-সদৃশ্য হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে, বিশ্বস্রষ্টা রবের প্রতিভূ মানুষ যদি আল্লাহর আখলাকে বিভূসিত হয়, তবে জড়-সম্পদ ও জড়-পরিবেশের উপর তাহার প্রভূত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়; এবং তখনই সে জড় পরিবেশের পটভূমিতে সগৌরবে নিজ শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করিতে পারে। তাই আমরা দেখিতে পাই, জীর্ণ কুটিরবাসী, ছিন্নবস্ত্র পরিহিত অর্ধভুক্ত অনাড়ম্বর মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ) ও তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচর খুলাফায়ে রাশিদীনের বিরাট ব্যক্তিত্বের সম্মুখে বিপুল ঐশ্বর্যশালী রোমান ও পারস্য সম্রাজ্যের স্বর্ণ-রৌপ্য খচিত পোশাকে সুসজ্জিত প্রতিনিধিবর্গ নিজদিগকে সাতিশয় ক্ষুদ্র ও ম্রিয়মান বোধ করিতেন। কিন্তু ইহার দ্বারা এরূপ বুঝায় না যে, জমিনের বাস্তব দিকের প্রতি ইসলাম কোনরূপ অবহেলা প্রদর্শন করে। মানুষ দুনিয়ার সম্পদরাজিকে উপেক্ষা করিবে না- স্বীয় প্রয়োজনে ভোগ করিবে; কিন্তু নিজেকে ভোগ-সম্পদের ভোগ্যবস্তুতে পরিণত করিবে না- ইহাই ইসলামী আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির মূল-তত্ত্ব। মানুষের যে সকল বৃত্তি ও তৎসংশ্লিষ্ট মূল্যবোধ ব্যক্তিত্বের সহজ বিকাশের সহায়ক, সে-গুলির পরিচর্যা এবং ব্যবহারিক ও জড়-পরিবেশে উহাদের প্রকাশ ইসলামী জীবনের আধ্যত্মিক সংস্কৃতি।

নৈতিক জীবনেঃ

যে-কোন কর্ম স্বভাবতঃ কর্মকর্তা বা অপর কাহারও ক্ষতি সাধন করে, ইসলামের দৃষ্টিতে তাহা দূর্নীতি অর্থাৎ নৈতিকতা-বিরোধী। কর্ম অর্থে কেবল হস্ত-পদাদি পঞ্চ কর্ম-ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বুঝায় না; চিন্তা ও অনুভূতিও ইহার অন্তর্ভূক্ত। অর্থাৎ কাহারও সম্পর্কে কুচিন্তা ও হিংসা-বিদ্বেষানুভূতিও নৈতিকতা-বিরোধী। ইহা ছাড়া ক্ষতিও এক প্রকারের নহে; ক্ষতি দৈহিক, মানসিক প্রভৃতি বিবিধ প্রকারের হইতে পারে। এই ক্ষতির প্রভাব ক্ষেত্রবিশেষে ইহকালে সীমিত থাকিতে পারে, আবার কোন ক্ষেত্রে ইহার পরিধি পরকাল পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে। এই ক্ষতি কখনও প্রত্যক্ষ গোচর হয়, আবার কখনও অগোচরে অবস্থান করে। যে-কোন কর্ম ক্ষতিকর, তাহাকে কুরআনুল-কারীম জুলুম বলিয়াছে। কুরআনুল-কারীম বলেন, যাহারা জালিম তাহারাই কাফির। তাই, যেমন আপোষহীনভাবে জুলুম-বিরোধী, সেই প্রকার মন গঠনের অনুশীলন এবং ব্যবহারিক জীবনে তাহার বহিঃপ্রকাশ নৈতিক জীবনে ইসলামী সংস্কৃতি।

ইসলামের নৈতিক বিধান কতকগুলি মন্ময় (Subjective) নীতির সমষ্টি নহে। ইহা অতিশয় বাস্তব, ব্যক্তি বিশেষের মনন-নিরপেক্ষ ও তন্ময় (Objective)। যে-কর্ম মানব-সত্তায় ও তাহার পারিপার্শ্বিক বস্তু-জগতে বিরাজমান সক্রিয় প্রাকৃতিক নিয়মে ক্ষতিকর ফল প্রসব করে, তাহাই জুলুম ও নৈতিকতা বিরোধী। সুতরাং ইসলামের দৃষ্টিতে নৈতিক জ্ঞান কতকগুলি অবাস্তব, সেচ্ছা-উদ্ভাসিত ভাল-মন্দের বিচার-বুদ্ধি নহে। যে-কোন কর্ম স্বভাবতঃ ব্যক্তি বা সমাজের সামগ্রিক, শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধিময় অগ্রগতিকে ব্যাহত করে তাহাই নৈতিকতা-বিরোধী, ইসলামী সংস্কৃতির পরিপন্থী। যে-ব্যক্তি জালিম অর্থাৎ জুলুম করে, যে ব্যক্তি জুলুমের সহায়তা করে এবং যে ব্যক্তি জুলুমের প্রতিবাদ করে না- ইসলাম তাহাদের সকলকেই জুলুমের জন্য সমভাবে দায়ী করেন। যে-প্রকারের ভোগ-লিপ্সা চরিত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া মানব-মনকে অন্যায়ের প্রতি প্রলুব্ধ ও অন্যায়-প্রবণ করে, তাহা জুলুমের উৎস।

এই জন্য পানাদি মাদকদ্রব্য সেবন, জুয়া খেলা, অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ নৃত্য-গীত-চিত্র-ভাস্কর্য ইত্যাদি এবং যৌন আবেদন-প্রবণ রূপ-প্রদর্শনী ইসলামী নৈতিক সংস্কৃতির পরিপন্থী; কিন্তু নৃত্য-গীত-চিত্র-ভাস্কর্য প্রভৃতি শিল্পের যে-প্রকারের সাধনা ও পরিবেশনা চিত্তকে পবিত্র জীবন-রসে সম্পৃক্ত করে, তাহা ইসলাম-বিরোধী নহে। একদিকে যেমন মুসলিম-সমাজে নারী জাতির অবলুপ্তপ্রায় অবরোধ প্রথা ইসলামী নৈতিক মূল্যবোধজাত ছিল না, অপরদিকে তেমনি তথাকথিত 'তরক্কী-পসন্দ' দিগের দেহকে বিপণি সাজাইয়া অন্যকে প্রলুব্ধ করার অপ-প্রয়াসও ইসলাম-বিরোধী।

অবরোধ-প্রথা ছিল রোমান, পারস্য ও রাজপূত আভিজাত্যের অনুকরণ এবং অবাধ ও শালীনতাবর্জিত রূপ প্রদর্শনী নিমজ্জমান পাশ্চাত্যে সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণ।

বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনেঃ

কুরআনুল-কারীম বলেন, আল্লাহ বিশ্ববাসীদের 'ওয়ালী' অর্থাৎ বন্ধু ও অভিভাবক, এবং তিনি তাহাদিগেকে তামস অর্থাৎ অজ্ঞনতা হইতে জ্যোতিঃ অর্থাৎ জ্ঞানের পথে পরিচালিত করেন। যাহারা কাফির, তাহাদের অভিভাবক শয়তান এবং শয়তান তাহাদিগকে জ্ঞানের পথ হইতে অজ্ঞাতার পথে পরিচালিত করে; ফলে উহারাই জাহান্নামী ও জাহান্নামেই উহারা চিরকাল অবস্থান করে। সুতরাং জ্ঞানই জান্নাত এবং অজ্ঞানতাই জাহান্নাম; কারণ, জ্ঞানই মানুষকে অন্যায় হইতে বিরত রাখে এবং অজ্ঞানতাই মানুষকে অন্যায়প্রবণ করে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, অগ্নি স্পর্শ করিলে দগ্ধ হইতে হয়, এই জ্ঞান আছে বলিয়াই কেহ অগ্নি স্পর্শ করে না। অগ্নি-স্পর্শ হইতে বিরত রাখার জন্য পুলিশ, প্রহরী, হিতোপদেশ অথবা সমাজ-শাসনের প্রয়োজন হয় না- এ বিষয়ে মানুষের প্রত্যক্ষ জ্ঞানই যথেষ্ট। অপরদিকে মাদকদ্রব্য সেবন দেহ, মন ও মস্তিষ্কের প্রভূত ক্ষতি সাধন করে; কিন্তু উহা সেবনে কি ক্ষতি হইল সংগে সংগে তাহা উপলব্ধি করার জ্ঞানের অভাব বশতঃই মানুষ পরিণামে এই কু-অভ্যাসের দাস হয়। সুতরাং জ্ঞানানুশীলন ইসলামী বুদ্ধিবৃত্তিক সংস্কৃতির ভিত্তি।

'জ্ঞানীর কলমের কালি শহীদের লহু অপেক্ষা মূল্যবান' --এ কথার ইহাই তাৎপর্য। যে-সকল বৃত্তি মানুষকে সংস্কারমুক্ত জ্ঞানপিপাসু করে, সে-গুলির পরিচর্যা এবং ব্যবহারিক জীবন ও জড়-পরিবেশে তাহার ফলিত রূপই ইসলামী বুদ্ধিবৃত্তিক সংস্কৃতি। জ্ঞানার্জনের জন্য চীন যাওয়ার নির্দেশের তাৎপর্যও ইহাই। কেননা, সেকালে চীনে শরীয়ত বা তরীকত শিক্ষার মাদ্রাসা ছিল না। এই প্রসঙ্গে ইহাও বিশেষভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, জ্ঞান এক প্রকার নহে, জ্ঞান মূলতঃ দুই প্রকার, বহিরীন্দ্রিয় বা বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞান এবং অন্তরীন্দ্রিয় বা বোধিলব্ধ জ্ঞান। ঈমান বিল গায়েব অর্থাৎ বহিরীন্দ্রিয়ের আয়ত্ত্বাতীত সত্যের অস্তিত্বে বিশ্বাস মু'মিন বা বিশ্বাসী হওয়ার প্রাথমিক শর্ত। তাই, প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়ার অনুসরণে অন্তরীনিদ্রয়ের উৎকর্ষ সাধন ইসলামী বৃদ্ধিবৃত্তিক সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংগ। যে শিক্ষা সমভাবে বুদ্ধি ও বোধির উৎকর্ষ সাধন করে, সেই বিশুদ্ধ শিক্ষা ও ব্যবহারিক জীবনে তাহাদের প্রয়োগ ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তিক সংস্কৃতি। ইসলামের জ্ঞানের ক্ষেত্রে বল-প্রয়োগ নিষিদ্ধ। কুরআনুল-কারীম বলেন, দ্বীন সম্পর্কে কোনরূপ বল-প্রয়োগ নাই। সুতরাং চিন্তা, বিবেক ও মতবাদ প্রকাশের স্বাধীনতা এবং পরমত সহিষ্ণুতা ইসলামী বুদ্ধিবৃত্তিক সংস্কৃতির অন্যতম আদর্শ। এই কারণেই খিলাফত-যুদ্ধে বিরুদ্ধ-মত পোষণের দায়ে কাহাকেও হ্যামলক বিষ পানে, অগ্নি-কুণ্ডে বা ফাঁসীর মঞ্চে প্রাণ হারাইতে হয় নাই।

সামাজিক জীবনেঃ

সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব ইসলামী সমাজের মূলভিত্তি। কিন্তু এই সাম্য যোগ্যতার নহে; ব্যক্তি-বিশেষের বিশেষ বিশেষ যোগ্যতার বিকাশের দ্বারা সমাজ-জীবনে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করার অধিকার ও সুযোগের সাম্য। সকল মানুষের যোগ্যতার মান এক নহে এবং যোগ্যতার বিষয়বস্তুও এক নহে। নিজ নিজ প্রতিভা বিকাশের সমান অধিকার ও সুযোগ লাভ করিলে সাহিত্যে, কেহ সংগীতে, কেহ দর্শনে, কেহ রাজনীতিতে, আবার কেহবা ক্রীড়া-কৌতুক বা জীবনের জন্য কোন ক্ষেত্রে আপন যোগ্যতা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতে পারে। রক্তাভিজাত্য ও উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের গৌরব অথবা বিশেষ কোন পেশা ইসলামী সমাজ জীবনে মানবিক মর্যাদার মাপকাঠি নহে। চারিত্রিক সততা ও কর্তব্যপরায়ণতাই সামাজিক মর্যাদা নির্ধারণ করে। ফলে, ইসলামের দৃষ্টিতে একজন সৎ ও কর্তব্যপরায়ণ চর্মকার অসাধু ও কর্তব্যবিমুখ রাষ্ট্রপ্রধান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। মানুষ ও মানবিক মর্যাদার প্রতি এই দৃষ্টিভংগিই ইসলামী সামাজিক সংস্কৃতির প্রথম সোপান।

ইসলামী ভ্রাতৃত্বের অর্থ সকল মানুষকে কর্মনিরপেক্ষ সমান মর্যাদা দান নহে- ভ্রাতৃত্বের অর্থ সকল মানুষের প্রতি ভ্রাতৃসুলভ সহানুভূতি। সততা, যোগ্যতা ও কর্তব্যপরায়ণতার অনুপাতে মানুষ সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। পক্ষান্তরে, অন্যায়কারী প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে ইহকালে, অথবা ইহকাল ও পরকাল উভয়কালে স্বীয় কৃতকর্মের ফল ভোগ করিবে। ইসলাম যাহা অন্যায়, তাহাকে ঘৃণা করিতে শিক্ষা দেয়; কিন্তু অন্যায়কারীকে ভ্রাতৃসুলভ সহানুভূতির সহিত অন্যায়ের পথ হইতে ফিরাইয়া লওয়ার নির্দেশ দান করে। কুরআনুল কারীমের মতে, অন্যায়কারীকে সুযুক্তি ও ভদ্র ব্যবহারের দ্বারা আহ্বান করা কর্তব্য। অন্যায় ও জুলুম প্রতিরোধের প্রয়োজনে ইসলামী আইন জালিমের শাস্তি বিধানের নির্দেশ দেয় এবং ইহার ফলে জালিম ও জুলুম বিরোধীর মধ্যে সংঘর্ষ দেখা দিলে কঠোর হস্তে দুষ্কৃতিকারীদের দমন অবশ্য কর্তব্য; কিন্তু ইহার পশ্চাতে থাকে শুভেচ্ছা ও কর্তব্যবোধ- অন্য কিছু নহে। বিশ্বমানবের এই সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের পরিচর্যা এবং ব্যবহারিক জীবনে ইহার বাস্তবায়নই সামাজিক জীবনে ইসলামী

সংস্কৃতি।

আর একটি কথা। ইসলামী সমাজের গাঠনিক ভিত্তি পরিবার। কোনদিন যদি ইসলামী বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের চরম আদর্শের বাস্তবায়ন হয় অর্থাৎ বিশ্বমানব যদি বর্ণ ভাষা ও ভৌগোলিক সীমারেখা অতিক্রম করিয়া এক মানব-জাতিতে পরিণত হয়, তবুও এই পরিবারই সে বিশ্ব মানব সমাজের গাঠনিক ভিত্তি থাকিবে। পারিবারিক সততা ও শান্তি না থাকিলে এবং এই পরিবারভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক আস্থা, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা না থাকিলে কোন এক সমাজ বা বিশ্বমানবের জীবনে সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধি আসিতে পারে না। এই কারণে পারিবারিক পবিত্রতা রক্ষা ইসলামী সমাজ-জীবনের আপোষহীন নীতি। পারিবারিক শান্তি ও সততা সমূলে ধ্বংস করে যৌন ব্যভিচার। তাই নর-হত্যা অপেক্ষা যৌন-ব্যভিচার ইসলামের দৃষ্টিতে জঘন্যতর অপরাধ ও অমার্জনীয়। নরঘাতক একজন মানুষকে হত্যা করে, কিন্তু ব্যভিচারী একটি পরিবার তথা সমাজকে হত্যা করে। ব্যভিচারের শাস্তি-প্রসংগে কুরআনুল কারীম দৃঢ়তার সহিত বলেন যে, ব্যভিচারীর শাস্তিদানে দয়া ও অনুকম্পার কোন স্থান নাই। সুতরাং যে কোন মূল্যবোধ অথবা কর্ম পারিবারিক জীবনের পবিত্রতা বিনষ্টের সহায়ক, তাহা ইসলামী সামাজিক সংস্কৃতির ঘোরতর পরিপন্থী।

অর্থনৈতিক জীবনেঃ

খিলাফত- এই কথাটির তাৎপর্য উপলব্ধিই অর্থনৈতিক জীবনে ইসলামী সংস্কৃতির জ্ঞান। কুরআনুল কারীম বলেন যে, আল্লাহ্ তায়ালা মানুষকে তাহার 'রব' গুণের খলীফা করিয়াছেন। যিনি স্রষ্ট্রা, পালনকর্তা ও বিবর্তক, তিনিই রব। খলীফার অর্থ প্রতিভূ। সুতরাং কুরআনুল-করীমের মতে আল্লাহ্ তায়ালা যে নিয়মে জ্বীনের সৃষ্টি, পালন ও বিবর্তন নিয়ন্ত্রন করেন, সেই নিয়মানুবর্তিতার মাধ্যমে নিজেকে এবং আল্লাহ্র সৃষ্ট অপর জীবকে পালন করার দায়িত্ব অর্পণ করিয়া তিনি মানুষকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। ইসলামও অপরাপর জীবন-দর্শনের মত জীবন ও জগতের প্রতি একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি শোষণ অথবা শাসনের নহে- পালনের; ইহাই খিলাফতের তাৎপর্য। আকাশমণ্ডুলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু বিদ্যমান, তাহাদের সকলের মালিক আল্লাহ্ তায়ালা- মানুষ নহে, তা সে ব্যক্তিই হউক আর ব্যক্তির সমষ্টি রাষ্ট্রই হউক। মালিকানা স্বত্ত্বের অর্থ ইচ্ছামত বস্তুর ব্যবহার, অব্যবহার ও অপব্যবহারের অধিকার। এই অধিকার মানুষের নাই। ইসলামে বিশ্বাসী মানুষ জড় সম্পদ অধিকার করিবে মালিকরূপে নহে- আল্লাহর 'রব' গুণের প্রতিভূরূপে। সুতরাং ইসলামী সংস্কৃতিতে, সম্পদের অধিকার ও ব্যবহার ইসলামের আদর্শ অনুযায়ী হইতে হইবে। অপরের কল্যাণে অন্তরায় ও উদাসীন না হইয়া সম্পদ ভোগের অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। কিন্তু এই ব্যবহারিক স্বত্ত্বাধিকার তাহাদিগকে অর্জন করিতে হয় আল্লাহ-প্রদত্ত শ্রম-শক্তির সদ্ব্যবহারের বিনিময়ে। কারণ, কুরআনুল কারীম বলেন, 'মানুষ যাহার জন্য শ্রম করে, তাহা ব্যতিরেখে কিছুই তাহার প্রাপ্য নহে।'

কোন সংগত কারণে যাহারা শ্রমে অসমর্থ সামাজিক জীবন-মানের পরিপ্রেক্ষিতে তাহাদের খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ও কর্মের সংস্থান- এই মৌল জীবিকোপকরণ সমূহের নিম্নতম প্রয়োজন মিটাইবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব সমাজের অর্থশালী ব্যক্তিদের স্কন্ধে ন্যস্ত রহিয়াছে। এই দায়িত্ব পালনেরই নাম 'হক্কুল ইবাদ' আদায় করা। সালাত কায়েমের নির্দেশের সহিত যাকাত কথাটি ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত থাকার গূঢ় অর্থ এই যে, 'হক্কুল ইবাদ' আদায় না করিলে সালাত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কুরআনুল কারীম বলেন, যে ব্যক্তি এতিমের দুশমন, বুভুক্ষুকে অন্নদানে বিমুখ এবং প্রতিবেশীর কল্যাণের প্রতি উদাসীন, সে দ্বীনকে অস্বীকার করে; তাহার সালাত অশুদ্ধ ও প্রদর্শনীসর্বস্ব; এবং এই প্রকার মুসুল্লিগণ অভিশপ্ত। যে-সমস্ত মূল্যবোধ ও গুণাবলী অর্থের উপার্জন ও ব্যবহার সম্পর্কে এর বিপরীত মানসিকতার উৎকর্ষ সাধন করে, তাহাদের পরিচর্যা এবং ব্যবহারিক জীবন ও জড় পরিবেশে সে-গুলির ফলিতরূপ অর্থনৈতিক জীবনে ইসলামী সংস্কৃতি।

রাজনৈতিক জীবনেঃ

খিলাফত, -এই কথাটির একটি বিশেষ রাজনৈতিক অর্থ আছে। কুরআনুল কারীম বলেন, আকাশমণ্ডুলী ও পৃথিবীর সার্বভৌম অধিকার একমাত্র আল্লাহর- মানুষের নহে, সে ব্যক্তিই হউক, আর ব্যক্তির সমষ্টি জাতিই হউক। সুতরাং ইসলামী রাষ্ট্র অথবা রাষ্ট্রপতি সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পন্ন নহেন। ইসলামী রাষ্ট্রের নাম খিলাফত অর্থাৎ প্রতিনিধিত্ব এবং রাজনৈতিক এই প্রতিনিধিত্বও আল্লাহর রবুবিয়াতের প্রতিনিধিত্ব। ইসলামী রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রপ্রধান ক্ষমতা অধিকার ও উহা প্রয়োগ করিবেন জনগণের কল্যাণে। রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি নর-নারী নিজের ব্যক্তিগত ব্যবহারিক জীবনে ও সংঘবদ্ধভাবে রাষ্ট্রকে উহার এই মহান কর্তব্য পালনে নিষ্ঠা ও সততার সহিত সাহায্য করিবেন। কারণ প্রত্যেক মানুষই আল্লাহর রবুবিয়াতের খলীফা- শুধু রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রপতি নহেন। ইসলামী রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপ্রধান ও নাগরিকের মধ্যে বিশেষ কোন বৈষম্য অথবা মর্যাদার প্রাচীর বিরাজ করে না। কেননা, এ ব্যবস্থায় কেহ কাহারও

দাসও নহে, প্রভুও নহে- পরস্পর ভাই-ভাই, এক আল্লাহর দাস এবং একমাত্র তাঁহারই অধীন। তাহাদের উভয়েরই দায়িত্ব এক আল্লাহর রবুবিয়াতের প্রতিনিধিত্ব করা এবং দ্বীনের নির্দেশ অনুযায়ী নিজেদের ব্যক্তি ও সমষ্টি-জীবন পরিচালিত করা। তাহারা প্রত্যেকেই সমাজের এক-একটি বিশেষ কর্তব্য পালনের দায়িত্বে আসীন। কেহ স্বীয় দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হইলে বা ভুল করিলে অপরের কর্তব্য হইয়া দাঁড়ায় তাহাকে সাহায্য করা বা সংশোধন করা। এই কারণে ইসলামী রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি ও সরকারের কার্যক্রম সাধারণের সম্মুখে উন্মুক্ত থাকে এবং প্রত্যেকটি নাগরিক তাহার সমালোচনা করিয়া উহা সংশোধনের অধিকার রাখে।

এই আদর্শের অনিবার্য অনুসিদ্ধান্ত আইনের শাসন। প্রাকৃতিক নিয়ম কাহারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে না। অগ্নির দাহিকাশক্তি আছে; যে কেহ অগ্নি স্পর্শ করিবে, তাহাকেই দগ্ধ হইতে হইবে- সে ব্যক্তি কোন সাধারণ নাগরিকই হউন, অথবা রাষ্ট্রপ্রধানই হউন। এইভাবে মানুষের দ্বীনের বিধানও কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব করে না। এই কারণে আইনের দৃষ্টিতে প্রত্যেকে সমান; অর্থাৎ প্রত্যেকের উপর আইনের বিধান সমভাবে প্রযোজ্য। এমনকি জন-স্বার্থ, জাতীয় মর্যাদা বা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা প্রভৃতির অজুহাতে খলীফা বা রাষ্ট্রপ্রধান এবং উচ্চতর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গও এ-ক্ষেত্রে কোনরূপ বিশেষ সুবিধা ভোগ করিতে পারেন না। তাই দেখিতে পাওয়া যায়, হযরত উমর (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ) কে পর্যন্ত খলীফার পদে অধিষ্ঠিত থাকা অবস্থায় সাধারণ নাগরিক কর্তৃক আনীত অভিযোগের জওয়াব দানের জন্য বিচারকের সম্মুখে আসামীর বেশে দাঁড়াইতে হইয়াছে। কুফার গভর্নরকে মদ্য পানের দায়ে চল্লিশ বেত্রাঘাতের দণ্ড মাথা পাতিয়া মানিয়া লইতে হইয়াছে। সাধারণের সাধ্যাতীত সীমায় স্বীয় জীবন-মান উন্নীত করার অপরাধে খলীফার নির্দেশে সিরিয়ার গভর্নরকে আত্মশুদ্ধির জন্য মদীনার উপকণ্ঠে মেষ চরাইতে হইয়াছে। এমন কি, খলীফা উমরের পুত্রকে পর্যন্ত মদ্যপানের দায়ে পিতৃহস্তে কঠোর শাস্তি গ্রহণ করিতে হইয়াছে। খিলাফতে যখন খলীফা হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য একজন নাগরিক পর্যন্ত সকলেই জন-কল্যাণের জন্য দায়ী, তখন এই গুরুদায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে প্রতিটি নাগরিকের জন্য বাক-স্বাধীনতা থাকা একান্ত অপরিহার্য। বাক-স্বাধীনতা না থাকিলে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিবাদ কেমন করিয়া হইবে? এইভাবে যে সমস্ত মূল্যবোধ ইসলামী রাষ্ট্রীয় আদর্শের সহায়ক, সেগুলির অনুশাসন এবং ব্যক্তি ও সমষ্টি-জীবনে তাহাদের প্রয়োগ রাজনৈতিক জীবনে ইসলামী সংস্কৃতি।

মানুষের জ্ঞান, বিশেষ করিয়া বস্তু-নির্ভর জ্ঞান আপেক্ষিক (Relative), কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সেই সীমিত জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন মানুষ নিজেদের জন্য জীবন-বিধান প্রণয়নের প্রচেষ্টা চালাইয়াছে- প্রয়াস পাইয়াছে মানব-জীবনের মূল সুর আবিষ্কারের। আর ইহা করিতে গিয়া কেহবা অর্থনৈতিক প্রয়োজন, কেহবা যৌন পিপাসা, কেহবা ক্ষমতা-লিপ্সা আবার কেহবা সৌন্দর্য প্রীতিকে জীবনের একমাত্র নিয়ন্তারূপে স্বীকৃতি দিয়াছেন। মানব-জীবনের এক-একটি বিশেষ দিকের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করিয়া অন্যান্য দিকগুলির প্রতি তাহারা প্রদর্শন করিয়াছেন অমার্জনীয় অবহেলা। ফলে, তাহাদের একদেশদর্শী মতাদর্শ মানব-সমাজে ডাকিয়া আনিয়াছে উত্তরোত্তর অধিক সংকট, সংঘাত আর অভিশাপ। জীবন-প্রবাহে এই সমস্ত বৃত্তিগুলির কোনটিরও প্রভাব ইসলাম অস্বীকার করে না, কিন্তু ইহাদের কোন-টিকেই জীবন তথা ইতিহাসের একমাত্র নিয়ন্তা বলিয়া মনে করে না। তাই, ইসলামের বিধান সমষ্টিগতভাবে মানব-প্রকৃতির স্থূল ও সূক্ষ্ম সবগুলি বৃত্তিরই সুসামঞ্জস ও কল্যণমুখী পরিচর্যা এবং ব্যবহারিক জীবন ও বাস্তব পরিবেশে উহার প্রকাশ। ইহাই ইসলামী সংস্কৃতির অর্থ এবং ইহাই মানব-সত্তার পূর্ণ বিকাশ তথা মানুষের সীমাহীন সম্ভাবনার পরম পরিণতি লাভের প্রকৃষ্টতম পন্থা।

সূত্রঃ আবুজর গিফারী সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত "রব্বানী দৃষ্টিতে" গ্রন্থ

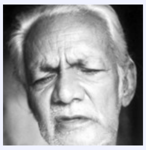

আবুল হাশিম

আবুল হাশিম ১৯০৫ সালের ২৭ জানুয়ারি পশ্চিম বঙ্গের বর্ধমানের কাশিয়াড়ায় জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা আবুল কাশেম বর্ধমানের কংগ্রস নেতা ছিলেন।
১৯২৩ সালের বর্ধমান মিউনিসিপাল স্কুল থেকে আবুল হাশিম ম্যাট্রকুলেশন পাস করে,কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৯২৫ সালে আই এ এবং ১৯২৮ সালের বি এ পাস করেন। ১৯৩১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগ থেকে বি এল ডিগ্রি লাভ করে বর্ধমান আদালতে আইন ব্যবসা শুরু করেন।
আবুল হাশিম ১৯৩০ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠকে মুসলিম সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা হিসেবে যোগ দেন। মুসলিম লীগে যোগ দিয়ে তিনি এর উদারপন্থী অংশ গড়ে তোলার কাজে মনোনিবেশ করেন। অনেক প্রগতিশীল বাঙালি মুসলিম তরুণকে তিনি উদ্বুদ্ধ করেন। ১৯৩৬ সালে তিনি বর্ধমান থেকে নির্দলীয় পার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বঙ্গীয় আইন সভায় সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩৭ সালের মুসলিম লীগে যোগ দেন। ১৯৩৮ সালে তিনি বর্ধমান জেলা মুসলিম লীগের সভাপতি ও ১৯৪২ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪৩ সালের ৭ নভেম্বর মুসলিম লীগ কাউন্সিল সভায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।
১৯৪০ সালে মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাবে পাকিস্তানকে একটি অখণ্ড রাষ্ট্র হিসেবে দাবী না করে ভারতের উত্তর পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট এলাকায় পৃথক পৃথক স্বাধীন স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হয়েছিল। সেই হিসেবে বাংলায় একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হবার কথা। কিন্তু ১৯৪৬-এর নির্বাচনে বিজয়ের পর ১৯৪৬ এর ৯ এপ্রিল দিকে দিল্লীতে আহুত মুসলিম লীগের নবনির্বাচিত বিধায়কদের সভায় মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র পরামর্শে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তান প্রস্তাব পেশ করেন। মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র এই প্রস্তাব উত্থাপনের পর বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিম খুব দৃঃঢ়ভাবে এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করেন। এরপর ভাষাভিত্তিক স্বাধীন বাংলা গঠনের প্রচেষ্ঠায় আবুল হাশিম বাঙালি কংগ্রেস নেতা শরৎচন্দ্র বসুর সাথে দেখা করেন। এদিকে ভারতের ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেনের তার চীফ অফ স্টাফ লর্ড ইসমকে ভারত বিভাগের ভিত্তিতে একটি পরিকল্পনা তৈরির নির্দেশ দেন। এই পরিকল্পনাটি প্ল্যান বলকান নামে পরিচিত। এই প্লান বলকান অনুযায়ী ভারতকে দুইয়ের অধিক অংশে বিভক্ত করার কথা হয়েছিল। ভারত ও পাকিস্তানকে দুই অংশে বিভক্ত করা এবং এর যে কোন অংশের অন্তর্গত কোন প্রদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে গঠিত হতে চাইল তার ব্যবস্থাও এই পরিকল্পনার মধ্যে ছিল। কিন্তু কংগ্রেস নেতা জওহরলাল নেহেরু ও কংগ্রেসের তীব্র বিরোধীতা শেষ পর্যন্ত স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলা গঠনের সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণ ভাবে রোধ করে। ১৯৪৭ সালের১০ মে আবুল হাশিম শরৎচন্দ্র বসুর সাথে মহাত্মা গান্ধীর সাথে তার সোদপুর আশ্রমে দেখা করেন। সেখানে আবুল হাশিম গান্ধীর নিকট সাধারণ ভাষা, সাধারণ সংস্কৃতি এবং সাধারণ ইতিহাস যা হিন্দু মুসলমান উভয়কে একসূত্রে আবদ্ধ করেছিল তার উপর ভিত্তি করে যুক্ত বাংলার উপর তার বক্তব্য তুলে ধরেন।
১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গ আইন সভায় বিরোধী দলের নেতা হিসেবে নেতৃত্ব দেন। এরপর পঞ্চাশের দশকের শুরুতে তিনি ঢাকায় চলে আসেন।১৯৫২ সালে তিনি রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হন। ভাষা আন্দোলনে জড়িত থাকায় তিনি ১৯৫২ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি গ্রেফতার হন এবং প্রায় ১৬ মাস কারাভোগের পর মুক্তিলাভ করেন। এরপর থেকে তিনি খেলাফতে রাব্বানী পার্টির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত তিনি এ পার্টির সভাপতি ছিলেন।
আইয়ুব খানের শাসনামলে আবুল হাশিম ইসলামিক একাডেমীর পরিচালক ছিলেন। এ পদে থাকার সময়ে তাঁর উদ্যোগে কুরআন শরীফের মূল আরবি থেকে বাংলায় তরজমা প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু ঐ সময়ও তিনি আইয়ুব খানের বাঙালি বিরোধী কার্যক্রমের প্রতিরোধ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৬৭ সালের ২২ জুন পাকিস্তান সরকারের বেতারমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দীন রেডিও টেলিভিশন থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচার বন্ধের ঘোষণা করলে তিনি এ সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানান।
তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলী হলোঃ দ্যা ক্রিড অফ ইসলাম (The Creed of Islam) -১৯৫০, এ্যাজ আই সি ইট (As I See It) ১৯৬৫, ইনটিগ্রেশন অফ পাকিস্তান (Integration of Pakistan)-১৯৬৭, অ্যারাবিক মেইড এসে (Arabic Made Eassy)১৯৬৯, রব্বানীর দৃষ্টিতে- ১৯৭০, ইন রেট্রোস্পেকশন (In Retrospection)-১৯৭৪। আবুলহাশিম ১৯৭৪ সালের ৫ অক্টোবর মৃত্যু বরণ করেন।